অপরজন

Aparjan – Bengali Webzine on Social, Cultural & Literary Issues

অপরজন – ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

সম্পাদক – দেবাশিস দত্ত
প্রচ্ছদ – ইন্দ্রনীল ঘোষ

সূচী...

- সম্পাদকীয় (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-editorial/)
- এখন এই সময় – দেবাশিস দত্ত (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-dedues/)
- বাঙালি জীবন ও আজকের বিশ্বায়ন – কৌশিক চট্টোপাধ্যায় (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-kaches/)
- এন এস ডি—একটি সফর, কিছু অভিজ্ঞতা – সৌরভ দত্ত (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-sadues/)
- আনিস আহমেদ-এর কবিতা (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-anahpo/)
- সৌমনা দাশগুপ্ত-এর কবিতা (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-sodapo/)

- [সুমন সাধু-এর কবিতা (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-susapo/)](https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-susapo/)
- [কিশোর ঘোষ-এর কবিতা (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-kighpo/)](https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-kighpo/)
- [অত্রি ভট্টাচার্য-এর কবিতা (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-atbhpo/)](https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-atbhpo/)
- [মণিদীপা সেন-এর কবিতা (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-mosepo/)](https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-mosepo/)
- [সংযুক্তা পাল-এর কবিতা (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-sapapo/)](https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-sapapo/)
- [শৌনক দত্ত-এর কবিতা (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-soudapo/)](https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-soudapo/)
- [শুভজিৎ গাঙ্গুলি-এর কবিতা (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-shgapo/)](https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-shgapo/)
- [টিপু সুলতান-এর কবিতা (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-tisupo/)](https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-tisupo/)
- [বেবি সাউ-এর কবিতা (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-bashpo/)](https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-bashpo/)
- [সুব্রত সরকার-এর কবিতা (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-subsapo/)](https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-subsapo/)

- [গল্প : সাদিক হোসেন (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-sahost/)](https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-sahost/)
- [গল্প : অভিষেক ঝা (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-abjhst/)](https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-abjhst/)

- [উদোমডাঙা নিয়ে দু'-পাঁচটা কথা যখন বলতে ইচ্ছা করছেই – নীলাঞ্জ চক্রবর্তী (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-nichcr/)](https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-nichcr/)
- [উপন্যস্ত: উপন্যাসের খোঁজে – দেবাঞ্জন মিত্র (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-demicr/)](https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-demicr/)

- [অনুবাদ: সমান্তরাল প্রেম, অসমান্তরাল কবিতা – স্বপন রায় (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-swrotr/)](https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-swrotr/)

- ['অপরজন'-এর মেল বক্স : সুবীর দত্ত-এর চিঠি (https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-suduma/)](https://aparjan.com/2019/02/27/february2019-suduma/)

অপরজন

Aparjan – Bengali Webzine on Social, Cultural & Literary Issues

বাঙালি জীবন ও আজকের বিশ্বায়ন – কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

গোড়ার কথা

উত্তর-দক্ষিণ নয়। এখন পূর্ব-পশ্চিম। একুশ শতকের বিশ্বায়ন এই দুই গোলার্ধেই বিশ্বকে দেখছে। এমনটি আগে ছিল না। বিশ শতকের বিশ্বায়ন তখন উত্তর-দক্ষিণেই তার তাত্ত্বিক বয়ান রচনা করেছিল। সে তত্ত্ব এখন পুরনো। একুশ শতকের বিশ্বায়ন জনজীবনকে নতুন মাত্রায় ও নতুন আঙ্গিকে করছে সম্প্রসারিত। সেই হিন্দোলে বাঙালি জীবনও আজ তার চাহিদা, রুচিবোধ, আগ্রহ, আবেগ, চিন্তা-চেতনা, ও মূল্যবোধের নিক্তি বিচারে নব বিস্তারে হচ্ছে প্রতিভাত। কোথাও তা স্পষ্ট, কোথাও খুবই অস্পষ্ট। কখনও তা বর্ণময়, কখনও বা বিবর্ণ।

বাঙালি আজ আয়নাকে ভয় পাচ্ছে। আয়নাতেই সে একদিন নিজেকে চিনেছিল। সেই বাঙালিই আবার আজ তার স্মার্ট ফোনকে জীবনের আয়না করে তুলেছে। কিন্তু কোন বাঙালি? পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি, না বাংলাদেশের? শিলচরের, না শিমুলতলার? আপাতত এই বিশ্বে বসবাসকারী, বাংলায় কথা বলা, মাছ-ভাতে সন্তুষ্ট, সুকুমার

সূক্ষ্মতাবোধে সম্পৃক্ত, ফুটবল প্রিয়, বাক্যবাগীশ এবং তর্ক প্রিয় বাঙালির কথাই না হয় একটু আলোচনা করা যাক। বাঙালী থেকে বাঙালি হয়েও কাঙালি ভোজনে সে আজও অনন্য।

বাঙালি আলোকায়িত। সেই আলোকায়িত বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা হোক এই প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় বিষয়। দেখা যাক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত এবং জাতিসত্তার প্রশ্নে বাঙালি ঠিক কোন জায়গায় অবস্থান করছে। বিশ্বায়িত বাঙালির জীবনে বিস্ময়েরই বা কি এমন নতুন ঘটনা ঘটেছে অথবা ঘটতে চলেছে যার দিকে আমাদের চোখ ফেরানো দরকার?

আলোচ্য প্রবন্ধ সেই সব দিকগুলিতেই আলোকপাত করবে। উঠে আসবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমাজতাত্ত্বিক গল্প। ধরা পড়বে ভুবনায়নের প্রশস্ত আঙিনায় তার পরাক্রমশালী অভিঘাতে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাঙালি জীবনাচারের নানান দিক।

ভুবন ডাঙ্গার মাঠে

বিশ্বায়ন অথবা ভুবনায়ন, যে নামেই ডাকি না কেন, তা হল একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় অঞ্চলের সঙ্গে বিশ্ব-পরিসরের সংযোগ তৈরি হয়। বিশ্ব যেমন অঞ্চলকে প্রভাবিত করে, তেমনি অঞ্চলও বিশ্বকে প্রতিনিধিত্ব করে। তবে এটা ঠিক সেই অর্থে পাশ্চাত্যকরণ নয়। আবার এটা আধুনিকীকরণও নয়। এটা হল সেই উভমুখী প্রক্রিয়া যেখানে দূরের সঙ্গে নিকটের রেণু সংযোগ ঘটে (দাশগুপ্ত ও চট্টোপাধ্যায়, ২০০১: ৩২৯)। আর সেই দুরন্ত প্রবাহের সংশ্রব-সংমিশ্রণে, ঘাত-প্রতিঘাতে, আমরা হয়ে উঠি ভুবনগাঁয়ের বাসিন্দা। স্বজ্ঞাত বোধিতে হাজির হয় আধিপত্যবাদের নয়া কৌশল।

সবাই সেটা দেখতে পায় না। সব সময় তা আবার দেখাও যায় না। সবাই সবক্ষেত্রে তা দেখবে, এমনটা প্রত্যাশা করাও অন্যায়। এই ন্যায়-অন্যায়ের বিচার সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি লঙঘনে ধার্য হয়। এগুলো এর মাপকাঠি। প্রথমে লঘু, পরে কড়া দাওয়াই দেওয়ার বৈধ নিয়ন্ত্রণ সমাজ জীবনে জারি থাকে। এগুলি পূর্বনির্ধারিত। এগুলোর হাজিরায় সমাজের ক্রিয়াগত কাঠামো বিন্যাসে একধরণের শৈলী প্রকাশ পায়। এগুলোই হল অঞ্চল-মানবের সঙ্গে বিশ্ব-মানবের সামাজিক অবস্থান পার্থক্যের পরিসর। এই পরিসর দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের অবকাশ হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। তবুও বিশ্বায়ন অঞ্চল-মানবের সঙ্গে বিশ্ব-মানবের যোগসূত্র স্থাপন করে।

সমাজ জীবনে অংশগ্রহণকারীর সামাজিক অবস্থান বস্তুনিষ্ঠ হয় ক্ষেত্রবিশেষেই। সাধারণভাবে সেটাই ঘটে থাকে। একজন সভ্য ভাবতেই পারেন যে তার কাছে সমাজটা একটা কারাগার। আবার সভ্যের অন্তরেই সমাজ লালিত হয়। কোনটা করা উচিত, আর কোনটা থেকে বিরত থাকতে হবে, তা আমরা শিশুকাল থেকেই শিখি। সেই কারণেই সামাজিকীকরণের প্রবাহে মানবসমাজ বয়ে চলে। এই প্রবাহের ভিন্নতাতেই সমাজ বহুরূপী হয়। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই চরিত্র চিত্রণে অঞ্চল-মানবের সঙ্গে বিশ্ব-মানবের বৈসাদৃশ্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। তবে সব ক্ষেত্রে তা দ্বান্দ্বিক নয়। কখনও তা আবার কিছু উপাদানের গুণগত ও সংখ্যাগত মানে সমতুল হয়।

সামাজিক উপাদানগুলি পার্থিব এবং অপার্থিব উভয় প্রকৃতিরই হতে পারে। উপাদানের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, জৈবিক এবং নৃগোষ্ঠীগত মাত্রার অবশ্য সমাজভেদ আছে। কোথাও কোথাও সময়ের অন্তরে সেগুলি

আবার মিলে যায়। আবার কখনও তা একে অপরের বিপরীত বাস্তবতায় মুখোমুখি হয়। এই পার্থক্য অঞ্চল-মানবের সঙ্গে বিশ্ব-মানবের যেমন আছে। তেমনই আবার অঞ্চল-মানব বাঙালি আর বিশ্ব-মানব বাঙালির চরিত্রেও সেই লক্ষণ দেখা যেতে পারে। বিশ্বায়ন ব্যক্তির থেকে ব্যক্তিকে দূরে সরাচ্ছে, কিন্তু উপাদানগুলিকে বাঁধাধরা ছাঁচে ঢালতে চাইছে। এটাই একুশ শতকের বিশ্বায়নের সমাজতাত্ত্বিক উপলব্ধি।

যাইহোক, অঞ্চল-মানব বাঙালি আর বিশ্ব-মানব বাঙালির চরিত্রে পার্থক্য আছে। বাঙালি অঞ্চল-মানব অবশ্য তার বিশ্ব-মানবরূপী ভূমিকায় অনন্য প্রকৃতির। সেটা কি রকম? উদাহরণে বিষয়টাকে একটু দেখা যেতে পারে। অঞ্চল-মানব বাঙালি হল আমার-আপনার মত ছাপোষা বাংলাভাষী। একটু আধটু হিন্দি, ইংরাজি বলার চেষ্টা করি কিন্তু বাক্য প্রকাশে বাংলা মিশে যায়। সুরে বাঙ্গালিয়ানা। আমি অমিতাভ ঘোষও না, আপনি নীরদ চন্দ্র চৌধুরিও নন। সুতরাং, অঞ্চল-মানব বাঙালি হিসাবে আমরা যা করার তাই করি।

বাজারের খবর অল্প-স্বল্প রাখি। রাজনৈতিক পরিস্থিতির খেউর আমাদের মজা দেয়। নিজের ধান্দা যাপনই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাথমিক লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। সাংস্কৃতিক প্রবর হওয়ার বাসনা কখনও জাগে না আমাদের মনে। কিন্তু হাওয়া বুঝে তীব্র সমালোচক। অন্যদিকে দিকে, বিশ্ব-মানব বাঙালি হল সাংস্কৃতিক সংকর (দাশগুপ্ত ও চট্টোপাধ্যায়, ২০০২)। তার বাঙালি সত্তা বিভিন্ন জীবনধারায় অভিযোজিত হয়েছে। প্রতিনিয়ত সে সেই পরিবর্তনশীলতার মধ্যে অবস্থান করছে। তবু সে সব ক্ষেত্রে শেকড় ছেঁড়া নয়। তবে তা সময়ের অপেক্ষা। উপযোজন তার দৈনন্দিন জীবনের এক অনিবার্যতা। জ্ঞানের নানা ধারায় যদিও তার আজও সাবলীল বিচরণ।

কিন্তু বাঙালি অঞ্চল-মানব তার বিশ্ব-মানবের ভূমিকায় কোথায় সে অনন্য? অনন্য সে তার নিজস্বতায়। শিকাগো শহরে দাঁড়িয়ে প্রথম সমন্বয়ের বার্তা দেয় বাঙালি। টেমস নদী তীরে বসন্তের কোন এক ভরা দুপুরে বাউল সঙ্গীতের যে সুর বাজে, সেখানেও বাঙালি। নিউ ইয়র্ক সিটি হলে আজ পুরুলিয়ার ছৌ শিল্পীদের প্রদর্শনী হয়। আফ্রিকার প্রান্তরে বসে রবীন্দ্ররচনা পড়া হয়। নোবেল কমিটি একাধিক বাঙালির নাম ধরে ডাকে। বিশ্ব-মানবের ভূমিকায় বাঙালি তার অবদানে ছাপ রাখে।

বাঙালি জীবন ও বিশ্বায়নের দুই পর্ব

বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় করিয়েছেন অতুল সুর। তিনি বলছেন বাঙলার আদিম অধিবাসীরা ছিল প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক। “নৃতত্ত্বের ভাষায় তাদের বলা হয় আদি-অস্ত্রাল” (সুর, ১৯৭৭: ২৫)। আলপীয়রা ছিল বাঙলার আগন্তুক জাতি। এই দু'য়ের মিশ্রণ বাঙালি জাতির প্রাথমিক রূপ গঠন করে। এই পরিচয়ে “আদি অস্ট্রিক” বা “ভেড্ডিড” উপাদানের আধিক্য থাকে (মুখোপাধ্যায়, ১৯৬০)। মার্কামারা বাঙালির চেহারা মাঝারি গোছের। ভেড্ডিড উপাদানই বাংলার জনগঠনের প্রধান ভিত্তি। কালক্রমে নানা অবস্থায় কমবেশি ইন্দো-আর্য ও শক-পামিরীয় উপাদান এবং পূর্বে মঙ্গোলীয় প্যারোইয়ান ও মালয়-ইন্দোনেশীয় উপাদান এসে মিশেছে। বাঙালির নিজস্ব গড়ন হয়েছে পাঁচমিশালী রক্তধারায় সম্পৃক্ত (মুখোপাধ্যায়, ১৮৭৯)। বাঙালির এই জাতি সংকর পরিচয় বিশ্বায়নের আদি পর্বকে ইঙ্গিত করে। বিশ্বায়ন এখানে নিছক গত শতাব্দীর নয়ের দশকে ঘটা অর্থনৈতিক সংযোগজাত ফলাফল নয়।

বাঙালির অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন ধনপতির সিংহল যাত্রার আগে ঘটে ছিল কিনা আমার জানা নেই। চাঁদ সওদাগরের কাহিনী নিশ্চিতভাবেই বাঙালির বিশ্বযাত্রাকে বর্ণনা করে। তবে সুতানুটির কলিকাতা হয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে শুধু পশ্চিমীকরণ নয়, বিশ্বায়নও মাত্রা পেতে থাকে। বিশ্ব-বাণিজ্যের বিস্তার বাঙালির আর্থিক জীবনে এক বড়সড় পরিবর্তন ঘটায় (সুর, ১৯৯৪)। সুনিপুণ হস্তশিল্প বিশ্বযোগে বাঙালির পরিচিতি সত্তাকে দীর্ঘদিন বহন করে। বিশ শতকের মন্বন্তর সেই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাক্কা।

বাঙালি আঞ্চলিক। বাঙালি বিশ্ব-মানব। বিশ্বায়নের দ্বিতীয় পর্বে এই ব্যাখ্যা নতুন নয়। সমাজতত্ত্বে এর তাত্ত্বিক পর্যালোচনা আছে। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর ১৯৪০ সালে প্রকাশিত *বাংলা ও বাঙালী* গ্রন্থে বাঙালির সেই বৈশিষ্ট্য খুঁজেছেন। বাঙালির ধ্বংসোন্মুখ চরিত্র প্রসঙ্গে তিনি সাবধানবাণী দিচ্ছেন। বাংলার আর্থিক ও সামাজিক অধোগতির দিকগুলিকেই তিনি নির্দেশ করেছেন। আক্ষেপের সুরে বলেছেন, “বাঙলার ক্ষয় ও অপকর্ষের প্রধান কারণ প্রাকৃতিক সাম্যচ্যুতি” (মুখোপাধ্যায়, ১৯৪০:৮০)। তিনি বাঙালির সত্তাকেও বুঝতে চেয়েছেন। এই সত্ত্বা নানা জাতির বহু প্রজন্মের রক্ত-মিশ্রণের ফল। প্রকৃতির ভাঙা-গড়া বাঙালি সেই জাতি সত্ত্বা জাগরণের প্রথম সহায়ক উপাদান হয়েছে।

পদ্মা ও মেঘনার নির্মম ভাঙা-গড়া বারোভুঁইয়াদের সাহস ও স্বাধীনতাপ্রিয়তাকে উদ্দীপিত করেছিল। বিশ শতকের ‘বাঙালী’, ভারতীয়তা থেকে তার বাঙালিত্বকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখেনি। শুধু রাধাকমল মুখোপাধ্যায় নন, আঞ্চলিক বাঙালিদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের কাজে বাঙালি বিশ্ব-মানব হয়ে উঠেছিলেন তাঁরাও বাঙালির অনন্য বৈশিষ্ট্যের খোঁজ করেছেন। তাঁদের রচনায় ফুটে উঠেছে বাঙালির জাতি পরিচিতি, তার সংস্কৃতি, তার কৌতুকপ্রিয়তা এবং তার সাহিত্য চেতনায় বাংলার চালচিত্র ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা।

যেমন ধরুন অতুল সুর। তিনি তাঁর *বাঙলা ও বাঙলীর বিবর্তন* (২০১২) শীর্ষক গ্রন্থে “বঙ্গ” শব্দটিকে একটি কৌমগোষ্ঠীর নাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শব্দটি প্রাগার্য তিব্বতীয় উৎস থেকে উদ্‌ভূত, না এটি একটি মুণ্ডারী ভাষার শব্দ, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে বৈদিক সাহিত্যে এই ভূমির উল্লেখ আমরা পাই। বৈদিক যুগের আর্যরা “পুণ্ড্র”-র ক্ষমতাকে অনার্য, অন্ত্যজ, অসুর হিসেবেই সমঝে চলতো। বিশ্বায়নের প্রথম পর্বে হস্তিবাহিনী সমৃদ্ধ বঙ্গদেশের বিশেষত্ব সেখানেই। হয়তো সেই কারণেই সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ভারতকে “সাধারণ” আর বাংলাকে “বিশেষ” বলেছেন। বাংলা ও বাঙালির বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে একান্ত আলোচনায় রবি ঠাকুরও তেমনটি বলেন। তাঁর ধারণায় বাংলার সাধনাক্ষেত্র শাস্ত্রগত বা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে বহুসংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র রচনা করে। জনমানসে গোরা এক বাঙালি চরিত্র হয়ে ওঠে। এই সব হল বিশ্বায়নের দ্বিতীয় পর্বে বাঙালির জীবনে দৈনন্দিন ঘটনা।

বাঙালিত্ব বিপন্ন হবে যদি গ্রাম্যজীবন বিপন্ন হয়। এই সমাজতাত্ত্বিক প্রকল্প প্রমাণে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল থেকে বিনয়কুমার সরকার, সকলেই ব্যস্ত। স্নেহার্ত বঙ্গভূমির পরিচয় রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ, সকলেই দেন। সংস্কার আন্দোলন বাঙালি জীবনকে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করে। যুগোপযোগী হওয়ার উদগ্র মনোবাসনায় বঙ্গভূমি পশ্চিমীকরণে সহায়ক হয়। উনিশ শতক থেকে বিশ শতকে আধুনিক বাঙলা নির্মাণের কাজ চলে (ঘোষ, ১৯৪৯)। রামনারায়ণ তর্করত্ন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, রাসসুন্দরী দেবী প্রগতিশীলতার বার্তাবাহক হন। প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বিজ্ঞান শিক্ষার আলোকে বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা হন। দেবীপ্রসাদ

চট্টোপাধ্যায় সেই আলোকে জনমানসে প্রতিষ্ঠা করতে চান। এই তালিকা আরও দীর্ঘ। তবে তাঁদের সমবেত প্রয়াসের সময়ের অন্তর, শিক্ষায়, শিল্প-সংস্কৃতিতে, সংগীতে, নৃত্যে, অভিনয়ে, স্বদেশীয়ানায়, আড্ডায় বাঙালির জীবনকে অতি স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহ্যের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের আদলে গঠন করতে সমর্থ হয়েছিল। বিশ্বায়নের দ্বিতীয় পর্বে বাঙালি বাস্তব-তৎপর, পরিবেশগ্রাহী, স্বজন-বৎসল থেকে বাস্তববিমুখ, মূঢ় ও আত্মতোষণপরায়ণ চরিত্রের অধিকারী হয়েছে।

সুতরাং, বিশ্বায়নের প্রথম পর্বে বাঙালির মানসক্ষেত্রের বিশেষত্ব তার ব্যপকার্থে "আধ্যাত্মিক" বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। দেবতাকেও সে ঘরের মানুষ করে নিয়েছে। সেই একাত্মতায় গ্রাম ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার কৃষিনির্ভর অর্থনীতি, পরিবার ও আত্মীয়তার পরিবর্ধিত আঙ্গিককে গড়ে তুলেছে। বাঙালি হয়ে উঠেছে সহিষ্ণু, আত্মসমালোচক এবং ভাষাগত ঐক্যে অটল এক জাতি। ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর *বাংলার সাধনায়* এবং ওয়াজেদ আলি তাঁর *ভবিষ্যতের বাঙালী* রচনায় গণতন্ত্রপ্রিয়, শান্তিকামী, বুদ্ধিমান, ভাবপ্রবণ, উদার বাঙালির চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। কুলগত ঐক্যে বাঙালি জীবন হয়েছে বিশ্বমানবতার আদর্শ রূপ।

বাঙালির ইতিহাস পরিচয় সেই সাক্ষ্য বহন করে। নীহাররঞ্জন রায় (১৯৪৯) সেই ইতিহাস খুঁজেছেন। সেই ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ বাংলার শিল্প-কর্মের ধারাকে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে সর্বোচ্চ স্থান দখল করতে সাহায্য করে যেখানে বাঙালি তাঁর নিজের মনোময়তা, আর নিপুণ ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় রাখে। দ্রুতবর্ধমান আত্মশক্তিবোধ ও সেই শক্তিতে পূর্ণ আস্থা রেখে চলা বাঙালি জীবন চর্চায় সহযোগিতায় বিশ্বাসী হয়েছে।

সেই বিশ্বাসে চির ধরেনি যে তা নয়। বিশ্বায়নের দ্বিতীয় পর্বে চিন্তে অসাড় হয়েছে বাঙালি। বাংলার লোকজীবন খণ্ডিত হয়েছে। দেখা দিয়েছে একটা "বনাম" রূপ। "লোক-সংস্কৃতি" বনাম "বাঙালি কালচার"। "ভদ্রলোকি" সংস্কৃতি সেই নতুন জীবন ধারার জন্ম দিয়েছে। শরিয়তি ইসলামের প্রসার আর ইংরেজ শাসন প্রণালী সেই নতুন ধারাকে ক্রমে পুষ্ট করেছে। যদিও বাংলার লোকজীবনের আর্থিক বুনিয়াদ মোটামুটি একই থেকে গেছে। জমিদার পোষিত বাঙালি সংস্কৃতির সেই ধারা সামাজিক সংকটের দিশারী হয় কিনা, তাঁর উত্তর খুঁজেছেন গোপাল হালদার। *বাঙালী সংস্কৃতির রূপ* (১৯৪৭) এবং *সংস্কৃতির রূপান্তর* (১৯৬৫) শীর্ষক তাঁর আকর গ্রন্থগুলির কথা এখানে বলা যায়। তিনি উল্লেখ করেন যে ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ (ইংরাজির ১৯৪৬ সন) থেকেই "নববর্ষকে" বাঙালি তার অভিনন্দনের ইতিহাসে সংযোজন করে। বাঙালির বদলে যাওয়া সামাজিক রীতির এই বর্ণনার পরও তিনি দাবি করেন যে বাঙালি বিচ্ছিন্নতাকে কোনো দিন সমর্থন করেনি।

বিশ শতকের বাঙালি জীবন বিশ্বায়নের দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তিকেও ইঙ্গিত করে। এই পর্বে বাঙালি সংস্কৃতির ভাগীদার হয়েছে সারা বিশ্ব। বাঙালি জীবনে বিশ্বায়নের এই পার্বিক প্রভাব যে সকল দিক থেকেই ইতিবাচক, তা বলা মুশকিল। বাঙালি তার ভাষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, লোকনীতি, ইত্যাদির পরিবর্তনও অবশ্য এই পর্বে ঘটিয়েছে। সে ইংরাজি শিখেছে। তার পোশাকে তখন পশ্চিমের ছোঁয়া (দাশগুপ্ত ও চট্টোপাধ্যায়, ২০০৪)। বাসগৃহ আর আগের মতো নেই। সেই জায়গায় আজ সে কোঠাঘর বানিয়েছে, অথবা সেই রকমের স্বপ্ন তখন সে জেগে জেগেই দেখে ফেলেছে। উদ্বাস্তু বাঙালিও তখন তার ভেসে চলার পথে ফেলতে শিখেছে প্রতিবাদের নোঙর। ঘটি হাতা ব্লাউজ হাতকাটা হয়েছে।

বিদ্যুতের আলোয় অথবা স্যুইচ দিলে পাখা ঘোরার ব্যবস্থায় বাঙালি জীবন এই শতকে অভ্যস্ত হয়েছে। ছায়াছবিতে বাঙালি। রেডিও শুনতে শুনতে সে বদলে ফেলেছে জীবনের অভ্যাস। এই যন্ত্র তার ঘরে এনেছে খবর, গান, নাটক, গল্প-দাদুর আসর। বাঙালির শৈশবেই তখন ঢুকে পরেছে গোয়েন্দা চরিত্রের রহস্যে মোড়া আচ্ছন্নতা। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছে নাটকের দল। গ্রামে হয়েছে পাঠাগার। তিন ফসলি জমিতে সেচের স্থায়ী ব্যবস্থা হয়েছে। পেকেছে তার সোনালী ধান। নানা উৎসবে অক্ষুণ্ণ থেকেছে সম্প্রীতির ঐতিহ্য।

বিশ শতকের বাঙালি তার আড্ডার স্থান বদলেছে। পাড়ার রক থেকে তা চায়ের দোকানে স্থানান্তরিত হয়েছে। মেস বাড়ির গল্প নিছক প্রেম কাহিনীতেই আবদ্ধ থাকেনি। বরং তা নারী শিক্ষার অগ্রগতিকেও নির্দেশ করেছে। দূরদর্শনে ফুটবল অথবা ক্রিকেট দেখার মজা তর্কবাগীশ বাঙালিকে করেছে বাক্যবাগীশ। শিথিল হয়েছে জাতের বাঁধন। বাঙালির গণমাধ্যম বহুগামিতার বার্তা দিতে শুরু করেছে। আরামপ্রিয় বাঙালি আঙ্গুলের ডগায় বিশ্ব-বিনোদনের নিয়ন্ত্রণ এনেছে। চটুলতায় সে লোক ঠকাতে শিখেছে। বেড়েছে তার সামাজিক সচলতা। বেড়েছে আর্থিক অসাম্য, রাজনৈতিক বিভেদ ও হানাহানি।

স্বাধীনতার নোনতা স্বাদে বাঙালি তার অধিকার চিনেছে। জমিদার বাড়ির নাটমঞ্চের ভিড় গ্রামের বারোয়ারী মুখো হয়েছে। তবে তার নগর অংশের জীবন, প্রকৃতির কথা ভাবেনি। কারখানার সাইরেনে শিল্পায়িত বাঙালির সোনালী দিন শুরু হয়েছে ঠিকই কিন্তু সে তার নদীকে মেরে ফেলেছে অর্বাচীনের আচরণে। বিকৃত শিল্প-সংস্কৃতির "ভদ্রলোকী" মোড়ক, শতাব্দীর শেষ লগ্নে এসে "গণসংস্কৃতির" রূপ ধারণ করেছে। ঠিক তখনই যৌথ পরিবারের মূল্যবোধ একক পরিবারের আদলে নতুন জীবনধারা রচনায় থেকেছে ব্যস্ত (চট্টোপাধ্যায়, ২০১৫)। বাঙালি সমাজের মুমূর্ষার পরিচয় হয়েছে স্পষ্ট। যদিও অল্পেতেই বিশ্রাম পেয়েছে বাঙালির মাতৃ জঠর।

অধিবৃত্তীয় বিশ্বায়ন ও একুশ শতকের বাঙালি

একুশ শতকের বাঙালি, বিশ্বায়নের তৃতীয় পর্বে দাঁড়িয়ে। এই নতুন বিশ্ব-সংযোগকে আমরা অধিবৃত্তীয় বিশ্বায়ন বলতে পারি। কেন অধিবৃত্তীয়? প্রথম কারণটা অবশ্যই বিশ্বের পূর্ব-পশ্চিম বিভাজন। বিশ্বায়নের এই দৃষ্টিকোণ পৃথিবীকে একটা "বেতের মোড়া" কল্পনায় বর্ণনা করে। পূর্বের জাতিরাষ্ট্র এখন পশ্চিমকে টেক্কা দেয়। এখানে সব কিছুই অনিশ্চিত এবং অপ্রত্যাশিত হয়ে পড়ে। বিমূর্ত অবয়বে কেবলমাত্র ঝুঁকি হয় অনিবার্য। উত্তরাধুনিক সংস্কৃতিতে পুষ্ট উত্তর-সত্যের এই উগ্রসময় নৈতিকতার নতুন ব্যাখ্যায় সব কিছুকেই একে অপরের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অযৌক্তিকের যুক্তিসিদ্ধতায় আত্মতুষ্টিই বিচারের শেষ মাত্রা হয়ে ওঠে। সামাজিক পুনঃমুল্যায়নের কোনও পরিসর এখানে থাকে না। পরিস্থিতির রাজনৈতিক বিবেচনায় গণতন্ত্রও বিশ্বাসঘাতক হয়ে উঠতে পারে।

সমাজের সেই সব ধারণাকে সংমিশ্রিত করে গাণিতিক সমাজতত্ত্বের পরিভাষায় এই বিশ্বায়ন "হাইপারবোলিক"। এখানে সরলরেখা তার অনিশ্চয়তার ভবিতব্যে বক্র হয়ে যায়। তাই সেই সরল ভানের বক্ররেখায় কোনো ত্রিভুজ কাঠামো আঁকলে যে তিনটি কোণ উৎপন্ন হয়, সমতলীয় জ্যামিতির মতো তাদের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রি হয় না। তার চেয়ে কম হয়। আর এই "ঋণাত্মক বক্রতাবিশিষ্ট" জ্যামিতিক ব্যাখ্যার মতো মৃত লেখকের বয়ানক্ষমতা জ্ঞানের নতুন মাত্রাকে নির্দেশ করে। বলা হয় একটি অদৃশ্য অক্ষের চারিদিকে সবকিছুই সমভাবে সাজানো, তবুও তারা

একে ওপরের থেকে দূরে সরে যায়। আর তৈরি হয় এক অধিবৃত্তীয় পরিসর যা হল বিশ্বায়নের একুশ শতকীয় বৈশিষ্ট্য।

বাঙালি জীবন আজ বিশ্ব অর্থনীতির আঞ্চলিক অংশ হিসেবে নানা মাত্রায়, নানা দিকে বয়ে চলেছে। কর্পোরেট আধিপত্যের অভিজ্ঞতা বাঙালির একুশ শতকীয় জীবনে একেবারেই ঘটেনি যে তা নয়। এই জীবন বিশ্ব-বাজারের অংশ। নেটওয়ার্ক দুনিয়ায় ডিজিটাল বাঙালির আজ উজ্জ্বল উপস্থিতি। বাঙালি পরিবার এখন বিশ্ব বৈদ্যুতিন অর্থনীতির অংশীদার। আমাজন, ইবে, ফ্লিপকার্ট, স্ন্যাপডিল সহ অন্যান্য ই-শপিং-এ সে অভ্যস্ত হচ্ছে আস্তে আস্তে। আবাস তার সেই গ্রামেই হোক, আর নগর সমাজেই হোক – সর্বত্রই ভোক্তা সংস্কৃতির সংক্রমণ। বিশ শতকের শেষে বাঙালি মহিলা ঘোমটা টানার অনভ্যাসে দুষ্টু ছিল। একুশ শতকের সেই বাঙালি মহিলা তার অঙ্গসজ্জায় লোকসমাজের অলংকার ত্যাগ করেছে (চট্টোপাধ্যায়, ২০১৪)। পরাবাস্তবতার মত্ততায় সে ভোগবাদে আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু আর্থিক স্বাবলম্বনের পক্ষে দাঁড়িয়ে গৃহস্থালির দাসত্ব থেকে সে মুক্ত হয়নি!

প্রযুক্তির ব্যবহারে বিকল্প আর্থিক সমীকরণ কি বাঙালি করে ফেলেছে? সমকালীন বাঙালি জীবনধারা কি সেই পথ গঠনে সহায়ক? বাংলার অন্তঃস্থল থেকেই বা তা কতটা উত্থিত? নয়া-উদারবাদী বিশ্বায়নেই বা সেই প্রক্রিয়া কতটা সম্পৃক্ত? এমন নানা প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে হবে না। একুশ শতক মুগ্ধ-মোড়কের রাজনৈতিক-অর্থনীতিকে সামনে নিয়ে আসে। এই প্রয়াস সাবেক বাঙালি ঐতিহ্যের পরিপন্থী। আজ দেখা দরকার নারীর ক্ষমতায়নের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাগুলো বাঙালি জীবনধারার অনুপন্থী হচ্ছে কিনা। “শপিং-মল” বাঙালির নতুন তীর্থভূমি কেন এবং কিভাবে হয়ে উঠছে সেই প্রশ্নেরও উত্তর খুঁজতে হবে। বুঝতে হবে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বান্দ্বিক পরিসরে বাঙালি কেন বিভ্রান্ত। আত্মঘাতী বাঙালির এই আত্মপ্রতারণার সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও আজ খুব জরুরি।

একুশ শতকে বাঙালি সংস্কৃতির লৌকিক রূপ প্রায় ফিকে হয়ে এসেছে (চট্টোপাধ্যায়, ২০১৬)। বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের স্তম্ভস্বরূপ যে ব্রতগুলো বিবাহিত, অবিবাহিত এবং বিধবা মহিলারা পালন করতেন আজ তার অনেক কিছুই বিলুপ্ত। আর যেগুলো এখনও পালনীয় তা নব প্রজন্মের কাছে নিছক একটা সামাজিক অনুষ্ঠান, যা ভালো সেলফি তোলার দিন। এই সেলফি সামাজিক গণমাধ্যমে তার দেওয়ালে সে প্রকাশ করে। বন্ধুদের পছন্দ-অপছন্দ ও মন্তব্যের প্রতিবেশে সে আত্মমগ্ন হয়। এই অবকাশে সে স্বাধীন। এটাই তার ব্যক্তিগত পরিসর। এই ভোগে ভৌগোলিক নৈকট্যে এক ঋণাত্মক প্রবাহ মাত্রায় তখন সেই স্বাধীনতার সংক্রমণ শুরু হয়ে যায়। সেই সঞ্চালনে একদিকে মিশ্র সংস্কৃতির উৎসধারাগুলি যেমন হয় জোরদার, অন্যদিকে তেমন বিশ্ব-সংস্কৃতির আবাহনে বাঙালি জীবনে একাকীত্বের ভিড় বাড়তে থাকে।

একাকীত্বের ভিড় বাঙালির নতুন সংকট। বিশ্বায়নের এই প্রভাব বাঙালি ক্রমশ টের পাচ্ছে। আভাসী বাস্তবতায় একুশ শতকের বিশ্বায়ন তাকে সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল শেখাচ্ছে। দৃক-কৃষ্টিতে সে সফল, কিন্তু এই প্রথম সে বিচ্ছিন্নতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠছে। সে মানছে যন্ত্রযুগ তার জীবনকে সহজ করেছে। রান্না ঘরের শিলনোড়া মিশ্রণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিস্থাপিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু উদ্‌বৃত্ত সময় ইতিবাচক কর্মধারায় নিয়োজিত থাকছে না (দাশগুপ্ত ও চট্টোপাধ্যায়, ২০০৭)। যেটা হচ্ছে তাতে ভণিতার সরল সংযোগ গড়ে তুলছে ঋণাত্মক-সম্পর্ক বিন্যাসের বিনির্মিত কাঠামো। এটাকে রক্ষণবাদীর প্রতিক্রিয়াশীলতা ভাবলে ভুল হবে।

শেষের কথা

১৯৩০ সালের এপ্রিলে নোয়াখালী মুসলিম ইন্সটিটিউটের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে এস ওয়াজেদ আলি তাঁর বাঙালি মুসলমান প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে আমাদের মুসলমানদের ধমনীতে বিদেশীর রক্তও আছে, আবার দেশীয় রক্তও আছে। আর্যের রক্তও আছে, আবার অনার্যের রক্তও আছে। তথাকথিত উচ্চ জাতীয় হিন্দুর রক্তও আছে, আবার তথাকথিত নীচু জাতের হিন্দুর রক্তও আছে। এই সবকে নিয়েই আমাদের গৌরব করতে হবে, এখন আমরা হচ্ছি বাঙালি।

বিশ শতকের এই পরিচিতি সত্তার রাজনীতি একুশ শতকে এসে বিচ্ছিন্নতার সমর্থক হয়ে ওঠে। ধর্মদ্রোহী আখ্যা অসহিষ্ণুতার প্রকাশ। মতবাদীকে হত্যা করে মতবাদ নির্মূল করার ভ্রান্ত ধারণায় মত্ত হতে চায় একুশ শতকের সেই বাঙালি যার পূর্বসূরিরা ধর্মান্ধতাকে তীব্র সমালোচনায় করেছিল দীর্ণ। অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রয়াসে বাঙালির এখন শেকড় ছেঁড়া পরিণতি। সামাজিক জীবনে সুষ্ঠু, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ এখন অনাস্বাদিত থাকছে। বিপন্ন আর্থিক অনিশ্চয়তার গ্রাসে যা অনুভূত হচ্ছে তা মাপা হাসি আর চাপা কান্নার ঘটনায় কাঠামায়িত।

পরিষেবা ও তথ্যের সমৃদ্ধি বাঙালির মজ্জাগত বিষয়। আধুনিক গণমাধ্যম এবং সামাজিক বার্তার বৈদ্যুতিন মাধ্যম হিসেবে টুইটার, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, শেয়ারচ্যাট, ইনস্ট্রাগ্রাম, প্রভৃতি সেই সমৃদ্ধিতেও থাবা বসিয়েছে। ভাষা সহ সকল কিছুই কেমন যেন ভাসা ভাসা। মূল্যবোধের অগভীরতার বৈশিষ্ট্যে বাঙালি জীবন আজ উপলব্ধ হয়। বিশ্বায়িত আপামর বাঙালি তার এই একুশ শতকীয় সংযোগে ডিজিটাল বউমার সন্ধান পেলেও তারা একে অপরের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। বৈদ্যুতিন নজরদারির ভেতর বাঙালির উপস্থিতি বাড়ছে ঠিকই কিন্তু ভাষার শ্বাসে বেঁচে থাকা বাঙালি অস্তিত্ব আজ আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রকাশেই বেশী ব্যস্ত। বিষয়টি অধিবৃত্তীয় বিশ্বায়নের মূর্ত রূপ গঠনে সহায়ক হচ্ছে। বিশ্বাঞ্চল ধারণাশ্রয়ী হয়ে সমাজতাত্ত্বিকগণ বিষয়টিকে দেখতে পারেন।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ:–

ঘোষ, প্রবোধ চন্দ্র। (১৯৪৯)। *বাঙালী*। কলিকাতা: সিটি কলেজ প্রকাশনী।

চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক। (২০১৪)। *দ্যা সোশিয়লজি অব ফ্যামিলি লাইফ*। কলকাতা: বুকস ওয়ে।

চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক। (২০১৫)। "ফ্যামিলি এন্ড গ্লোবালাইজেশন: অ্যা সোশিয়লজিক্যাল ডিসকোর্স", দেখুন *শিঞ্জন*, খণ্ড ১, সংখ্যা, ১। পাতা, ১৫৯-১৭৯।

চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক। (২০১৬)। "কালচারাল গ্লোবালাইজেশন ইন টোয়েন্টি ফাস্ট সেঞ্চুরি: অ্যা মার্কসিস্ট ইন্টারপ্রিটেশন", দেখুন *শিঞ্জন*, খণ্ড ২, সংখ্যা, ৩। পাতা, ১৯-৩৬।

দাসগুপ্ত, সমীর এবং চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক। (২০০১)। "বিশ্বায়ন ও উন্নয়ন", দেখুন পবিত্র সরকার (সম্পাদিত), *বিশ্বায়ন, গণতন্ত্র ও তৃতীয় বিশ্ব*। যাদবপুর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। পাতা, ৩২৭-৩৪২।

দাসগুপ্ত, সমীর এবং চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক। (২০০২)। *গ্লোবাল ম্যালাডি ইন দ্যা থার্ড ওয়াল্ড: অ্যা রিফ্লেক্সসন।* কল্যাণী: প্রতীতি প্রকাশনী।

দাসগুপ্ত, সমীর এবং চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক। (২০০৪)। "গ্লোবালাইজেশন এন্ড ডিস্প্যারিটি: অ্যা রিএ্যাপ্রেজাল", দেখুন সমীর দাসগুপ্ত (সম্পাদিত), *দ্যা চেঞ্জিং ফেস অব গ্লোবালাইজেশন।* নিউ ইয়র্ক: সেজ পাবলিকেশন। পাতা, ১৮৯-২২৬।

দাসগুপ্ত, সমীর এবং চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক। (২০০৭)। "অ্যাপ্লাইয়েড ভার্সান অব রুরাল পভার্টি: অ্যা কেস স্টাডি", দেখুন সমীর দাসগুপ্ত (সম্পাদিত), *ডিসকোর্স অন অ্যাপ্লাইয়েড সোশিয়লজি।* লন্ডন: এন্থেম প্রেস। পাতা, ১০১-১১৬।

মুখোপাধ্যায়, সুভাষ। (১৯৬০)। *বাঙালীর ইতিহাস।* কলিকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ। (১৮৭৯)। *বাঙ্গালার ইতিহাস।* কলিকাতা: দ্য সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি।

মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল। (১৯৪০)। *বাঙলা ও বাঙালী।* কলিকাতা: রসচন্দ্র-সাহিত্য-সংসদ।

রায়, নীহাররঞ্জন। (১৯৪৯)। *বাঙালীর ইতিহাস।* কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

সুর, অতুল। (১৯৭৭)। *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়।* কলিকাতা: জিজ্ঞাসা।

সুর, অতুল। (১৯৯৪)। *চোদ্দ শতকের বাঙালী।* কলিকাতা: উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির।

সুর, অতুল। (২০১২)। *বাঙলা ও বাঙলীর বিবর্তন।* কলিকাতা: সাহিত্যলোক।

হালদার, গোপাল। (১৯৪৭)। *বাঙালী সংস্কৃতির রূপ।* কলিকাতা: অগ্রনী বুক ক্লাব।

হালদার, গোপাল। (১৯৬৫)। *সংস্কৃতির রূপান্তর।* কলিকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি।

[লেখক: কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, এম. এ, পি এইচ. ডি., সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, প্রফেসর নুরুল হাসান কলেজ, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ]